প্রথম অধ্যায়

আফসার আমেদ : সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়

আফসার আমেদ : সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়

"আমৃত্যু লিখব। লিখে যেতেই হবে। কেন-না লেখা দিয়ে যদি কিছু করা যায়। সমাজবিশ্বে মানুষের কত দুঃখ-দুর্দশা, কত অপ্রেম-অসহায়তা, অসাম্য, নীচতা, হিংসা, বঞ্চনা আর অসম্মান, তার বিরুদ্ধে লিখে যেতেই হবে। কেন-না, 'এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা ....' ।"[১]— এমনই সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সাহিত্যিক আফসার আমেদ 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপকের প্রতিভাষণে। এই বক্তব্যটুকুর মধ্য দিয়ে তাঁর মনের অনেক কাছে পৌঁছে যায় পাঠক। ছুঁতে পারে লেখকের লেখনীর বিষয়ভাবনাকে; প্রকাশ হয়ে পড়ে সমাজ-মানুষের অসহায়তাকে বিদূরিত করার দৃষ্টিভঙ্গি। চারপাশের সমাজের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতার জায়গাটিও নিজস্ব কৌশলে উঁকি দিয়ে যায়। আফসার আমেদ নিজে প্রায় সারাজীবন-ই দারিদ্র্যের সঙ্গে সহাবস্থান করেছেন— লড়াই চালিয়েছেন প্রতিকূলতার মোকাবিলায়। তাঁর ভাবনাতে তাই সেই মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা, বঞ্চনা, অসম্মান দূর করার অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি তাঁর সাধ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে কলমের আঁচড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। এমনই এক ব্যক্তিসত্তার মাত্র ঊনষাট বছরের জীবনকাল পর্বের ওঠা-পড়া, চাওয়া-পাওয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

বাঙালি আত্মপরিচয়ে বিশ্বাসী কথাকার আফসার আমেদের জন্ম ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির শংসাপত্র অনুসারে তাঁর জন্ম হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল।[২] সনবিভ্রাটে সরকারি নথিভুক্তকরণের সময় তাঁর দু-বছর বয়স বেড়ে যায়। এখানে প্রকৃত বয়স মান্যতা পাবে।

আফসার আমেদের ডাকনাম কালো। আর এই নামকে বিরোধিতা করার জন্যই যেন সমাজের অন্ধকারকে বিদারণের আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি মেতে ওঠেন। মনে পড়ে যায়, প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁরও গায়ের রং-এর সঙ্গে সাযুজ্যবশত সবাই কালো মানিক বলে ডাকত। আর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সেই ডাকনামটিই একটু পরিমার্জন করে তিনি গ্রহণ করেন। সাহিত্যের অঙ্গনে ডাকনাম 'মানিক'ই স্থায়ী আসন লাভ করে। সচেতন পাঠক মাত্রই এ বিষয়ে অবিদিত। তবে আফসার আমেদের ক্ষেত্রে তেমন ঘটনা ঘটেনি, তিনি নিজ নামেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

লেখক আফসার আমেদের মাতা আরফা বেগম স্নেহময়ী জননী ছিলেন। তবে সাংসারিক কাজকর্ম ও দারিদ্র্যের মধ্যেও আরফা বেগম বই পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। মনের সংকীর্ণতা মুক্তির তাগিদে তিনি বই পড়ার নির্দিষ্ট সময় বের করেন। তিনি দুপুরবেলা তাঁর ভাসুরদের আলমারি থেকে বই চুরি করে পড়তেন। আবার পড়া শেষ করে নির্দিষ্ট স্থানে রেখেও দিতেন। সেই বই চোর একদিন ভাসুরদের কাছে ধরাও পড়ে যায়। তবে, এ বিষয়ে মায়ের কোনো শাস্তি হয়েছিল নাকি মায়ের লুকিয়ে বই পড়ার বিষয়টি সবার সমর্থন পায়— এ ব্যাপারে লেখক সবাইকে অন্ধকারে রেখেছেন। কিন্তু মায়ের বই পড়া নিয়ে তিনি গর্বিত ছিলেন। তাঁর কথায়— 'মা যে কত বই পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।'[৩] আফসার আমেদের পিতা সেখ খলিলুর রহমান সমাজের কেউকেটা ব্যক্তি ছিলেন না; দিন আনা-দিন খাওয়া শ্রমিক শ্রেণিভুক্ত মানুষ ছিলেন। পরে তাঁর বিস্তারিত আলোচনায় ফিরব। আফসার আমেদরা পাঁচ ভাইবোন ছিলেন। দুই দিদির পর বড়ো ছেলে হিসাবে তাঁর জন্ম। তারপর

এক ভাই ও এক বোন। দিদিদের নাম মঞ্জুরা বেগম ও নাদিরা বেগম। ভাই রফিক আমেদ এবং বোন কোহিনূর বেগম।

আফসার আমেদের ঠাকুরদাদা সেখ জামালুর রহমান সেই সময়ের হিসাবে শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তখন ম্যাট্রিক পাশ করা গর্বের ব্যাপার। ম্যাট্রিক পাশ ছেলেকে দূর-দূরান্তের মানুষরা বিস্ময় নিয়ে দেখতে আসত। তিনি পরে এজি বেঙ্গলের সুপারিনটেনডেন্ট হয়েছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যু হয়। ঠাকুমার নাম আয়েশা বেগম। তাঁদের এগারোটি সন্তান। এর মধ্যে আটটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। লেখকের পিতা সেখ খলিলুর রহমান ছিলেন সাত নম্বর সন্তান। তিনি সন্তানদের মধ্যে ছোটোর দিকে হওয়ার জন্য তেমন পড়াশোনা করার সুযোগ-সুবিধা পাননি। তাই তাঁকে সারাজীবন ধরে প্রচুর পরিশ্রমসাধ্য মজুর-শ্রমিকের কাজই করতে হয়েছে।

দেশভাগ সাধারণ মানুষের জীবনে ভীষণরকম প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা। এই দেশভাগের ঢেউ এসে পৌঁচেছে সেখ জামালুর রহমানের পরিবারেও। তাঁর একাদশ পুত্র-কন্যার বেশিরভাগই চলে যান পূর্ববঙ্গে; থেকে যান তাঁর সপ্তম পুত্র সেখ খলিলুর রহমান। তাঁর পত্নী তথা লেখক আফসারের মা আরফা বেগমের অনিচ্ছাতে মূলত তিনি রয়ে যান পশ্চিমবঙ্গের হাওড়াতেই। কড়িয়া গ্রামে লেখকদের দু-টি পাকা রান্নাঘরসহ চার কামরার দোতলা বাড়ি ছিল। লেখকের তিন-চার বছর বয়সকালে এক জ্যাঠা ও ছোটো কাকা দেশত্যাগের উদ্যোগ করেন। তাঁদের ঘর দু-টি তাঁরা বিক্রি করতে চান। সেই দুইটি ঘরের একটি পাড়ায় বিয়ে হওয়া লেখকের ছোটো পিসিমা কিনে নেন। নিজেদের সম্পত্তি বাইরের

লোকের হাতে চলে যেতে না দিলে অবশ্যই অবশিষ্ট ঘরটি লেখকদের কিনতে হবে। লেখকরা কিনতে না পারলে গ্রামের অন্য কেউ তা কিনে নেবে। কিন্তু জন্মভূমির মতো নিজেদের বাড়িকেও আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন খলিলুর রহমান ও আরফা বেগম। বিকিয়ে দিতে চাননি পরিবার বহির্ভূত অন্য কারো হাতে। তাই প্রচুর কষ্ট সহ্য করেও জ্যাঠামশাইকে ঘর কেনার টাকা তাঁরা মিটিয়ে দেন। লেখক এক সাক্ষাৎকারে সেই কষ্টকর সময় ও পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করেছেন—

> "সে এক অসহনীয় সময়। বাবা কখনো চাষে খাটতেন, ধান কল চালাতেন। হঠাৎই বাবা বিহারের চাঁইবাসায় কাজ করতে চলে গেলেন এক চিনামাটির খনিতে। গ্রামে বসে মানি অর্ডারে মা বাবার মাইনের অনেকটা অংশ টাকা পেতেন। জেঠাকে ঘর কেনার টাকা মেটাতেন।"[৪]

উদ্ধৃত চাঁইবাসার চিনামাটির খনিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার টুকরো স্মৃতি ধরা পড়েছে লেখকের বাল্যের স্মৃতিচারণায়। তিন-চার বছর বয়সকালে কয়েক মাসের জন্য সপরিবারে তাঁরা চাইবাসা বেড়াতে যান। সেখানকার কিছু আদিবাসী নারী-পুরুষের সঙ্গে লেখক পরিবারের বন্ধুত্ব হয়। তাদের মধ্যে ফুলমতিয়া নামক এক আদিবাসী রমণীর কথা লেখকের বিশেষভাবে মনে পড়ে। সে ছোট্ট আফসারকে খুব ভালোবাসতো, স্নেহপরবশ হয়ে একবার কাউকে না জানিয়ে লেখককে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায় ও অনেক কিছু খাওয়ায়। এদিকে কাউকে বলে না নিয়ে যাওয়ায় সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় ও তিন-চার বছরের ছোট্ট ছেলেটিকে নানা জায়গায় খুঁজতে আরম্ভ করে। তারপর সন্ধ্যায় ফুলমতিয়া লেখককে

ফিরিয়ে দিয়ে আসে। এই ঘটনার কিছুদিন পর লেখকের বাবা ছাড়া সবাই গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। খলিলুর রহমান কর্মস্থলেই থেকে যান। লেখকরা ফিরে আসার কয়েকদিন পর চাঁইবাসায় দাঙ্গা শুরু হয়। খনির ম্যানেজার (চেন্নাই-এর) তাঁর বাবাকে খবরের কাগজের আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। সাতদিন পর সেনাবাহিনী এসে ম্যানেজারের তৎপরতায় খলিলুর রহমানকে উদ্ধার করে আনে। আদিবাসীরা সেনাবাহিনীর জিপকে তীর-ধনুক নিয়ে আটক করে এবং খলিলুর রহমানকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। কিন্তু বাস্তবে সেনাবাহিনী আদিবাসীদের কথা রাখে না। ফলস্বরূপ খলিলুর রহমান প্রাণে রক্ষা পান। শৈশবের সেই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ লেখকের মনে সারাজীবন দাগ রেখে যায়।

স্মৃতিই থেকে যায় মনের মণিকোঠায়, সময় বয়ে চলে সময়ের হাত ধরে— এই সত্যকে স্বীকার করে আফসার আমেদের জন্মস্থান কড়িয়া গ্রামে অতিবাহিত তাঁর বাল্য–শৈশব–কৈশোরের দিনগুলি সন্ধান করা বিধেয়। তিনি আলালের ঘরের দুলাল ছিলেন না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ'-এর সমতুল অনুন্নত, প্রত্যন্ত এক গ্রাম কড়িয়া-তে তাঁর জন্ম। অত্যাধুনিক সুযোগ–সুবিধার আলো একেবারেই পৌঁছায়নি সে গ্রামে। কাঁচা রাস্তা, বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন সে সময়ের কড়িয়া গ্রাম যেন আদিম কোন জনজীবনের বাসভূমি। লেখকদের বাড়িটিও ছিল বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মতো; বাড়ির পার্শ্ববর্তী আট–দশ কিলোমিটার ধরে বিস্তৃত ছিল ক্ষেত। সেই 'খোলা মাঠ' থেকেই বোধ হয় 'দিলখোলা' হওয়ার শিক্ষা পেয়েছেন লেখক। যার ভুরি ভুরি প্রমাণ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রতিফলিত। সেই দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেতের মাঝে চারটি আমগাছ ঘেরা লেখকদের বাড়ি। লেখকের কল্পনাপ্রবণ মন রাত্রিতে

গাছগুলিকে উটের মতো লম্বা দেখত। এছাড়া, অন্যান্য 'গাছগাছালি'-র মাঝে জোনাকির ঝিকিমিকি লেখককে অন্য এক মুগ্ধতার জগতে টেনে নিয়ে যেত। ভীষণ দারিদ্র্য, অবহেলার মাঝেও সেই আলো-আঁধারি পরিবেশে নিজেকে নতুন অনুভবে খুঁজে পেতে আরম্ভ করেন শৈশব-কৈশোরের আফসার। সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও অপরিসর স্থানের কারণে লেখকরা পাঁচ ভাই বোন ও মা আরফা বেগম একটা বিছানাতে শুতেন। বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ আছে— 'যদি হয় সুজন, তবে এক শয্যায় ন জন।'[৫] কিংবা 'যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় দু'জন।'[৬] লেখকদের একত্রিত শোবার বিষয়টি এই প্রবাদগুলিকে স্মরণ করায়। ছোটো ছোটো ভাই বোন থাকলেও মায়ের পাশটিতে জায়গা হত আফসারের-ই। দুই দিদি আফসারকে অপরিমিত ভালোবাসলেও মায়ের পাশটিতে আফসারের শোওয়া নিয়ে অর্থাৎ বেশি আদর পাওয়ায় তাদেরও অভিযোগ ছিল। দুই দিদি এবং ভাই-বোন সবাই এ নিয়ে ঝগড়া করত। মা আরফা বেগম তাদের গল্পের মধ্য দিয়ে কোনো রূপকথার জগতে নিয়ে যেতেন আর সেই কল্পনার ডানায় ভর করে অপরিণত মন চলে যেত ঘুমের রাজ্যে। মায়ের এই প্রেরণাই যে তাঁকে লেখালেখিতে উৎসাহ দিয়েছে তা তিনি বিভিন্নভাবে স্বীকার করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

> "শৈশবটা কেটেছে দারিদ্র্যে, খাওয়া-দাওয়া, পোশাকের অস্বাচ্ছন্দ্যে। তবে মায়ের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা আমাকে হয়তো আখ্যানচর্চার অভিমুখী করেছে।"[৭]

লেখক-বন্ধু অনিশ্চয় চক্রবর্তীর উপলব্ধিজাত ধারণায় এ বক্তব্য আরও দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়—

> "মাসিমার সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝতাম আফসারের শিল্পবোধ, ওর ভাষা, ওর শব্দচয়ন, ওর সাহিত্য— সব কিছুর উৎস আফসারের মা, আমার মাসিমা।"[৮]

মায়ের বলা গল্পের মতোই অতি সাধারণ কিছু বিষয়, লেখার অনুপ্রেরণা হিসাবে তাঁর মনে দাগ কাটে। সেগুলির মধ্যে কড়িয়া গ্রামের গ্রামবাসীদের নিজস্ব প্রয়াসে অভিনীত যাত্রাপালার কথা বলেছেন লেখক। এই যাত্রাপালার প্রস্তুতি হিসাবে দু-চার মাস ধরে রিহার্সাল চলত। দু-একজন মহিলা অভিনেত্রীকেও ভাড়ায় আনা হত। সারারাত্রিব্যাপী যাত্রাপালার আসর চলত। বাল্যকালের রাতজাগা সেই অবাক, বিস্মিত চোখ যাত্রাপালার মধ্য থেকে খুঁজে নিয়েছিল নিজস্ব ক্ষেত্রটি। বলিষ্ঠ স্রষ্টা হওয়ার অনুপ্রেরণা হিসাবে যাত্রাপালার ভূমিকা তাই আফসারের জীবনে অনবদ্য। ছোটোবেলায় ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে দেখা যাত্রাপালা তাঁর মনে এঁকে দিয়েছিল কল্পনার রঙিন ফানুস। এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তাঁর সেই অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্ত করেছেন— 'আমার সেই বাল্যকালে যাত্রাপালা দেখার প্রভাবে আমি লেখার এক অনুপ্রেরণা পেলাম।'[৯] আবার, লেখার ক্ষেত্রে নিজ অন্তরের তাগিদও তাঁকে উৎসাহী করে তুলেছে। নিজের মনোজগতের অনুভূতিকে তিনি প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

> "ছেলেবেলায় মনে হত লেখালেখির ব্যাপারে আমার কিছু করার আছে। আমার মতো করে আমারও কিছু বলার আছে। আমার কৈশোর-বাল্যের যা কিছু সমকালীন লেখাজোখা পত্র-পত্রিকায় ও বইয়ে পড়তাম, সেই

পাঠের ভিতর খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়তাম, এই প্রতিক্রিয়ার বোধে যে, যা-যা পড়ছি, তাতে আমি অখুশি, অতৃপ্ত— আমি যেন তার ভিতর আর একভাবে বলতে চাই। আর লিখতে বসার উৎসাহ খুঁজে পেতাম। বিশেষত গ্রামের মানুষ জীবন নিসর্গ আমার বাল্যকৈশোরে যে ঘনিষ্ঠতায়, সত্যে, ঔদার্যে ও সহজাত অনুভূতিতে ধরা দিয়েছিল, তার সাক্ষাৎ তেমনভাবে আমার সঙ্গে ঘটছিল না সেই সব সাহিত্যপাঠের ভিতর। আর সেই তাড়নায় বুঝি বা লিখতে বসা আমার।

হয়তো বা যা লেখা হয়েছে, যা লেখা হচ্ছে, তার অন্য-এক বয়ান চাইছিলাম আমি।"[১০]

এমনভাবেই আত্মবিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠেছেন লেখক। লেখার ক্ষেত্রে এই অনুপ্রেরণা-ই পরিণতি পেয়েছে আজকের কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ-এ।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও আফসার শিক্ষিত মানুষ। প্রথাগত শিক্ষাক্ষেত্রে ছোট্ট আফসারের প্রবেশ কড়িয়া গ্রামেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আফসার প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে একসময় মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছে যান আফসার। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাইনান বামনদাস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তবে সেই সময়ের অতিক্রান্ত দিনগুলি লেখক ও তাঁর পরিবারের কাছে খুব সহজ, সরল ছিল না। ষাটের দশকে সামাজিক সংকট চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। চারিদিকে অন্নের জন্য তীব্র হাহাকার; রেশন, কেরোসিনের দোকানে দীর্ঘ

লাইন। আফসারের বাবা খলিলুর রহমান তখন কলকাতা বন্দরের নিয়মিত কর্মী। কিন্তু মাইনে পেতেন সামান্যই। কলকাতার মেসে থাকা–খাওয়ার খরচ চালাতে গিয়ে মাইনের খুব কম টাকাই অবশিষ্ট থাকত। তাই সংসারের জন্য বেশি টাকা পাঠাতে পারতেন না। সেই চরম থেকে চরমতম দুর্দিনে পারিবারিক–রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল লেখকদের মতো সাধারণ মানুষজনকে। এর ফলস্বরূপ অনাহার, অর্ধাহারে কেটেছে তাঁদের বেশ কিছুটা সময়।

ন্যূনতম খাদ্যের চাহিদা মানুষের প্রাথমিক চাহিদাগুলির অন্যতম। যেখানে খাবার জোটে না সেখানে পড়াশোনা অনেকটাই বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। বিলাসবাহুল্যহীন জীবনে লেখক আফসার বিদ্যালয়ে মাইনে দিতে অপারগ ছিলেন। সেইহেতু পরীক্ষার ফলও জানতে পারতেন না। মাইনে না দেওয়ায় পাশ না ফেল এটুকুও না জানতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেন। বই কেনা তো দূর অস্ত ব্যাপার। তবে এত কষ্টের মধ্যেও লেখকের মা আরফা বেগম আশা ছাড়েননি। মূলত তাঁর চেষ্টাতেই আফসার মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ পান। এরপর ১৯৭৭ সালে শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউটে উচ্চমাধ্যমিক পড়ার জন্য ভর্তি হন। বাদ সাধে পারিবারিক আর্থিক অনটন। দারিদ্র্যতার কারণে পড়াশোনা সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলেও তিনি হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবই তাঁকে পৌঁছে দেয় উদ্দিষ্ট লক্ষের দোরগোড়ায়। এই অসাধ্যসাধন মানসিকতার পরিচয় তাঁর জীবনকাহিনির মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বছর দু-য়েকের ব্যবধানে তিনি আবার নিজের চেষ্টায় লেখাপড়ার মধ্যে ফিরে আসেন। লেখালেখির পথ

ধরেই খুলে যায় তাঁর একের পর এক শিক্ষার দরজা। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বাগনান কলেজ থেকে পাশ করেন উচ্চমাধ্যমিক। এরপর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও লাভ করেন। তাঁর কথায়— 'উচ্চমাধ্যমিক, বি.এ. ও এম.এ. লেখালেখির দক্ষিণাতে নিজেই খরচ মিটিয়েছি।'[১১] ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাগনান কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ সাম্মানিক ডিগ্রি লাভ করেন। স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার ঠিক দুই বছর পর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর হন। তখন তিনি রীতিমত একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার পূর্বে তাঁর প্রথমদিকের সাহিত্যচর্চা নিয়ে আলোচনা করা শ্রেয়।

ক্লাস সিক্স সেভেন থেকেই আফসার আমেদের লেখালেখির সূত্রপাত ঘটে। প্রথম থেকেই কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ভিন্নধর্মী সাহিত্য রচনাতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তবে লেখা পছন্দ না হলে কয়েক মাস পরে ছিঁড়ে তা নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হতেন না। লেখার ক্ষেত্রে এমনই মর্জিমেজাজ চলত তাঁর। নিজের মনের আবেদনকে মান্যতা দিতে তিনি বেশি উৎসাহী ছিলেন। অপছন্দের কোনো কিছুই তাঁর কাছে তেমন আমল পায়নি।

আফসার কথাসাহিত্যিক হিসাবে পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করলেও কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্য জগতে পদার্পণ। সারাজীবন ধরেই তিনি অজস্র কবিতার স্রষ্টা। কিন্তু কাব্যগ্রন্থ হিসাবে সেগুলি প্রকাশের কোনো তাগিদ তিনি কোনোদিনই অনুভব করেননি। এর কৈফিয়ৎও তিনি দিয়েছেন— কবিতা তাঁর একান্ত আপনার সামগ্রী, গদ্য সৃষ্টির পথপ্রদর্শক। আবার, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দায় থেকে মুক্ত হতেও তাঁর এ এক কৌশল বলা যেতে পারে—

"কবিতা আমার কাছে প্রাণের জিনিস। আখ্যানচর্চায় নিরবচ্ছিন্ন থাকার একপ্রকার ওয়ার্ময়াপ। অনেক কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো রাখিনি। নিজেকে গদ্যের সৃষ্টিতে থাকার যোগ্য করে তোলার জন্য কবিতা আমার অবলম্বন।"[১২]

কবিতাকে আফসার সোপান উত্তরণের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'সংযম'। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন মিশ্রের সম্পাদিত চলমান সাহিত্য পত্রিকাতে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। যদিও তাঁর আত্মপ্রকাশের কেন্দ্রস্থল গল্প, যা প্রকাশ করতেও তিনি বেশি সময় নেননি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত আকারে তাঁর 'মনের মানুষ' গল্পটি 'ময়দান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন যুগ্মভাবে বন্ধু কাজী কামালউদ্দিনের সঙ্গে স্বয়ং আফসার আমেদ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আটটি গল্পের সম্ভারে সজ্জিত হয়ে আফসারের প্রথম গল্পগ্রন্থ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিক্ষণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। গল্পগ্রন্থটির নাম— 'আফসার আমেদের ছোটগল্প'। গ্রন্থটি তিনি শ্রী অশোক সেনকে উৎসর্গ করেন। আফসারের রচিত প্রথম প্রবন্ধও তাঁর খুব অল্প বয়সকালে তৎকালীন অন্যতম বিখ্যাত পত্রিকা 'পরিচয়'-এ প্রকাশ পায়। ১৯৭৮-এ প্রকাশিত আফসার আমেদের প্রবন্ধটির নাম— 'মুসলমান অন্দরে বিয়ের গীতি'। প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বা বিলুপ্তপ্রায় বিয়ের গানের বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। প্রথাগত রীতিতে 'সাহিত্য সংখ্যা' হিসাবে বৈশাখ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকার সংখ্যাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আর সেই বিশেষ সংখ্যাতেই প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে লেখক

আফসার আমেদের রচনাটি মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশ বিষয়ে একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা লেখক উল্লেখ করেছেন—

> "১৯৭৮ সালে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম একটি প্রবন্ধ নিয়ে পরিচয় পত্রিকায়। লেখক কপি নিতে গিয়ে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেশ রায় আমাকে দেখে অবাক হলেন। প্রবন্ধটি বাংলাদেশের কোনো বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত লিখেছেন মনে করে সম্পাদক ছেপে দিয়েছিলেন।"[১৩]

প্রকৃতপক্ষে, এমন সমৃদ্ধ লেখা কিশোর একটি ছেলের লেখনী— একথা সেসময় কেউ-ই ভাবতে পারেননি; বিস্মিত হয়েছেন সবাই। অমলেন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন—

> "শুনেছি, বড়ো পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশের পর কপি চাইতে গিয়েও লেখকের আরেক ঝকমারি। বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ, দেবেশ রায় এবং পত্রিকা অফিসে সেদিন অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই সহাস্য কৌতুকে একটি অবিশ্বাস্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন— এই বালকই আফসার আমেদ।"[১৪]

অমলেন্দু চক্রবর্তীই বাগনান বি.ডি.ও অফিসের উন্মুক্ত মাঠ প্রাঙ্গণে শীতের কোনো এক সন্ধ্যায় আয়োজিত স্থানীয় ছেলেদের 'সাহিত্য আসর' থেকে আফসারকে আবিষ্কার করেন। আফসার তখন বাগনান কলেজে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। নবীন সম্ভাবনাময় লেখককে লেখা চালিয়ে যাওয়া ও ভালো লেখা মনে হলে কলকাতায় পাঠাতে উৎসাহিত করে তিনি ফিরে আসেন। দিন-সাতেকের মধ্যেই আফসার অচেনা কলকাতার অলিগলি চিনে অমলেন্দু

চক্রবর্তীর বাড়িতে উপস্থিত হয়; সঙ্গে একটি প্রবন্ধ ও মোটাসোটা খাতা। আফসারের স্পর্ধায় প্রথমে বিরক্ত হন অমলেন্দুবাবু। কিন্তু তারপরই সেই খাতার মধ্যে রত্নখনির সন্ধান পেয়ে তিনি আশ্চর্য ও বিস্মিত হয়ে ওঠেন। বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পাঠের সময় থেকেই আফসার নানা অঞ্চল ঘুরে লোকজীবনের গান, ছড়া, প্রবাদ সংগ্রহে রত হন। তারই ফসল সঞ্চিত হয়েছে মোটাসোটা খাতাটির পাতায় পাতায়। এরপর তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন; বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'দপ্তরিপাড়ার ডায়েরি' নামক তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। কিন্তু একথা ভাবতে অবাক লাগে, সারাজীবন গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের চর্চা করে; সাহিত্যসাধনার সূচনালগ্নে লোকগীতির বিশ্লেষণধর্মী অসামান্য প্রবন্ধ লিখলেও প্রাবন্ধিক হতে তিনি চাননি। প্রথম প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> "আমি প্রাবন্ধিক হতে চাইনি। যে সমাজ আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, মুসলমান সমাজ, তার অন্তর-বাহিরকে অনুভব করতে করতে, তাদের লোকজীবনকে ধরতে ধরতে 'বিয়ের গীত' পেলাম, পেলাম 'ছড়া', 'প্রবাদ প্রবচন'। সে-সবই আমাকে প্রবন্ধ লিখতে তৎপর করেছে। কিন্তু 'আখ্যানচর্চা'ই আমার প্রধানতম চর্চার বিষয়।"[১৫]

এমনভাবেই আফসার আমেদ নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাভাবনার উৎসভূমির সন্ধান দিয়েছেন।

'আখ্যানচর্চা'-তে যে লেখক নিজেকে নিয়োজিত করতে চান, তাঁর পক্ষে উপন্যাসের পথ অনুসন্ধান খুব বেশি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রেও তাঁর অন্যথা ঘটেনি।

আফসার আমেদ স্নাতক হবার পূর্বেই ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'শারদীয় কালান্তর' পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘরগেরস্তি' প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি পরের বছরই গ্রন্থরূপ পায়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে স্বরলিপি প্রকাশনী উপন্যাসটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রথম লেখালেখির পর্বটি খুব অল্প বয়সেই অতিক্রম করেছেন আফসার আমেদ। সেই হিসাবে কৈশোরেই পেয়েছেন লেখকের সম্মান।

সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় স্রষ্টা ছাড়াও পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে উঠে আসে আফসার আমেদের নাম। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'ময়দান' পত্রিকার সম্পাদনা দিয়ে যার সূত্রপাত। এছাড়া কলেজে পড়াকালীন ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'কালগোধূলি' পত্রিকা অশোক পোড়িয়ার সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। ১৯৮৪-তে তরুণ সিংহের সহায়তায় 'আর্যভট্ট' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। আবার, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাগনান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'জাগর' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন আফসার আমেদ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাগনানে আফসার আমেদ একটি লেটার প্রেস তৈরি করেন। নাম দেন 'কথামালা'। প্রেসটি ছিল তাঁর বন্ধু অরূপ মিদ্যার বাড়ির ঠিক বিপরীতে। নিজের প্রেসেই আফসার কাজের ফাঁকে ফাঁকে দিন-রাত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। সেই আড্ডার মধ্যেই তাঁর কয়েকজন বন্ধু (অরবিন্দ, দিলীপ, অরূপ, গৌরীদা প্রমুখ) মিলে আফসারকে সম্পাদক করে 'জাগর' পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। দুঃখের বিষয়, অর্থের অভাবে তিন বা চারটি সংখ্যা বেরবার পরই তাঁরা পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। সেই পত্রিকায় আফসার কলকাতার লেখকদের পাশাপাশি মফস্সলের বন্ধুদের লেখা ছাপারও ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ শহর ও গ্রামীণ

সাহিত্য সৃষ্টিকর্মের মেলবন্ধনের প্রয়াস লক্ষিত হয়। পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গেই নিজের লেখালেখি, 'কথামালা' প্রেসের কাজ এবং পড়াশোনাও চালিয়ে যান। তবে, প্রেসটিকে তিনি বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। 'জাগর' পত্রিকা বন্ধ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর তাঁর প্রেসের চাকাও স্তব্ধ হয়ে যায়।

আফসার আমেদ মনে-প্রাণে চেয়েছেন গল্প–উপন্যাস লিখতে। সেই যাত্রাপথে কবিতাকে অবলম্বন করেছেন কিন্তু তাকে স্বীকৃতি দেননি। অনেকটা গোপন প্রেমিকার মতো। পত্নীরূপে পাশে নিয়ে চলার সম্মান কবিতা পায়নি আফসার আমেদের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকুই বলার, কবিতা বা প্রবন্ধ আফসারের কাছে প্রতিষ্ঠা না পেলেও সেগুলি হয়ে উঠেছিল তাঁর পথ চলার পাথেয়। কারণ, প্রবন্ধের সূত্র ধরেই তাঁর বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের সঙ্গে আলাপ। পরবর্তীকালে আফসার দেবেশ রায়ের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮৪— ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেবেশ রায়ের সম্পাদিত 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার অংশকালীন সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন। এছাড়া, এইসময় আফসার জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপি থেকে অনেক রচনা তথা গল্প–উপন্যাসের পাঠোদ্ধার করেন। যেগুলি পরবর্তীতে প্রথিতযশা দেবেশ রায়ের সম্পাদিত বারো খণ্ডের অপ্রকাশিত জীবনানন্দসমগ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। দেবেশ রায় ছাড়াও অরুণ সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং শুভ বসুর সঙ্গেও আফসারের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক এদের সঙ্গে মধুর সম্পর্কের কথা স্মরণ করেছেন—

"দেবেশ রায়, অরুণ সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত ও শুভ বসুর বাড়ি আমার বাড়ি হয়ে উঠল। কলকাতা গেলে বিশেষ করে অরুণ সেনের বাড়িতে দু-চার দিন থেকে যেতাম। আমাকে তাঁদের একজন করে নিয়েছিলেন।"[১৬]

'পরিচয়' পত্রিকার অফিসে গল্প জমা দিতে গিয়ে আলাপ প্রাবন্ধিক অরুণ সেনের সঙ্গে। অবহেলাভরে গল্পটি নিলেও প্রথম কয়েক লাইন পড়ে তিনি দেবেশ রায়কে তা পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন। দেবেশ রায় তৎক্ষণাৎ তা পড়ে ফেলেন ও কিশোর লেখককে তা ছাপার প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে একটি গল্প পড়ে ভালো লাগার সুবাদেই অরুণ সেন ও দেবেশ রায়ের সঙ্গে লেখকের সুমধুর সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস ছাপা হয়েছে তৎকালীন বিখ্যাত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। লেখক নিজেই সেই সুমধুর স্মৃতি ব্যক্ত করেছেন—

"তারপর গল্প উপন্যাস লেখাই আমার প্রধান বিষয় হয়ে উঠল। একটার পর একটা গল্প উপন্যাস লিখছি, দ্রুত ছাপা হয়ে যাচ্ছে পরিচয়, বারোমাস ও কালান্তর শারদীয়তে। আমার প্রবেশ একটা ঘটনা হয়ে উঠল। লেখা ছাপানোর সমস্যা আমার থাকল না।"[১৭]

এইভাবে ধীরে ধীরে সাহিত্যের মূল অঙ্গনে আফসার আমেদের কথাসাহিত্যিক হিসাবে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্রজীবনেই আফসার ছোটোখাটো লেখক হিসাবে পরিচিতি পান। তবে তিনি কোনোদিনই তাঁর শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইদের কথা ভোলেননি। মনের মণিকোঠায় থেকে গেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক— সকলেই। তিনি যে খুব ভালো ছাত্র ছিলেন তা নয়, তাই সবসময় মাস্টারমশাইদের প্রিয়পাত্রও হয়ে ওঠেননি। তবে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রজবিন্দু বোধক বা বুড়ো মাস্টার কিংবা হাইস্কুলের শিশির আদক ও বিপদ ভঞ্জন জাঠি-র কথা কোনোদিনই ভোলেননি। শিশিরবাবু জীবনের শেষে এসে তাঁর সঙ্গে থাকতে চেয়েছেন। বাগনান অঞ্চলে লেখকদের বাড়ি লাগোয়া জায়গাও কিনেছেন কিন্তু বাড়ি করে উঠতে পারেননি। শারীরিক অসুস্থতায় ব্যয়িত হয়েছে জীবনের সমস্ত সঞ্চয়। তবুও ২০১০ খ্রিস্টাব্দে লেখকের 'বঙ্কিম পুরস্কার' পাওয়ার সাক্ষী থেকেছেন শিশিরবাবু। নিজ ছাত্রের সম্মানে তিনি যে কি পরিমাণ গৌরবান্বিত, লেখকের পুরস্কার প্রাপ্তির সঙ্গী হওয়াতেই তা প্রমাণিত। আবার, অমনোযোগীর তকমা নিয়ে হাইস্কুলের মণিলাল দত্ত ও সত্যব্রত রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাইনান বামনদাস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবপ্রসাদ রায়ের সুনজরে আসেন— হাওড়া জেলায় গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে। বাগনান কলেজে গৌর গোস্বামী ও কার্তিক ভদ্র মহাশয় লেখককে বিশেষ স্নেহ করতেন। অধ্যাপক কার্তিক ভদ্র আফসারের লেখার মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। লেখকের স্মৃতিতে তা প্রতিফলিত—

"কার্তিক ভদ্র অনার্স পড়াতে ক্লাসে এসে বলতেন, 'তুই আজ ক্লাসটা নে'। বা আমার সাম্প্রতিক কোনো গল্প পড়েছেন, তার প্রশংসায় সারা ক্লাস কথা বলে চলেছেন।"[১৮]

ছাত্র হিসাবে এ বড় সম্মানের। তাঁর অকালপ্রয়াণে লেখক ভীষণ মর্মাহত হন। আফসার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে পেয়েছেন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বদের। তাঁরা হলেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নরেশ জানা, মানস মজুমদার প্রমুখ। অধ্যাপক মানস মজুমদার লেখককে ক্লাসে দেখলে স্নেহবশত বলতেন— 'তুমি ক্লাস করছ কেন, তোমার তো এখন পুজোর লেখা, বাড়ি গিয়ে লেখো গিয়ে।'[১৯] শিক্ষকদের প্রতি লেখকের বিনীত শ্রদ্ধা, ঋণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

"প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে আমার এই শিক্ষকমণ্ডলী, যাঁদের শিক্ষাদানে ও সাহচর্যে উপকৃত হয়েছি। নিজেকে সাজাতেও পেরেছি।"[২০]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীনই আফসারের লেখা গল্প-উপন্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে অধ্যাপকমহল ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমালোচিত হতে থাকে। সাহিত্যিক বিমল মিত্রের প্রশংসাসূচক চিঠি তাকে উৎসাহিত করে। রুশতী সেন তাঁকে নিয়ে 'পরিচয়'-এর পাতাতেই প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স রুমে ছাত্রাবস্থায় আড্ডা দেওয়ার বিরল আমন্ত্রণ পান; সুবীর রায়চৌধুরী, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছ থেকে। তখন তিনি সবেমাত্র বি.এ.

সাম্মানিকের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সেইসময় নানান জড়তা তাকে পরিবেষ্টিত করে ছিল। লেখকের কথায়— 'অধ্যাপকরা ধরতে পারেননি আমি তখন বি.এ. সাম্মানিকের প্রথম বর্ষের ছাত্র।'[২১] গুণী অধ্যাপকদের এই অভ্যর্থনা তাকে রোমাঞ্চিত, আলোড়িত করে তোলে। তিনি নিজেই বলেন— 'সাহিত্যে প্রথম প্রবেশের দিনগুলিতে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছি।'[২২]

আফসার আমেদ অল্প বয়স থেকেই নানান লেখক সম্মেলন, সাহিত্য সম্মেলন কিংবা আলোচনাচক্রে বক্তা হিসাবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্নাতক হবার পূর্বেই সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক আয়োজিত বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া ও মণিপুরী লেখকদের আমন্ত্রণমূলক আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। এই আলোচনাটি ভারতীয় ভাষা পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬-তে কলকাতার বাইরে লখনৌ শহরে সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে লেখক হিসাবে আমন্ত্রণ পান। ওই বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও সাহিত্য অকাদেমির যৌথ উদ্যোগে ছাত্রদের জন্য একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সেখানে লেখক হিসাবে আমন্ত্রণ পান আফসার। এ বড় সম্মানের জায়গা। তাঁর অনুভূতিতে— 'ছাত্র হিসেবে লেখক হয়ে ওঠার বিড়ম্বনা কম ছিল না।'[২৩] এরপর ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে আফ্রো-এশিয়া লেখক সংঘের অধিবেশনে লেখক হিসাবে আমন্ত্রণ পান। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে আসামে বরাক উপত্যকার সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি যে শুধু লেখক বা বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন তা নয়, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'উদীচী'র ডাকে সাড়া দিয়ে ঢাকা-খুলনা-যশোহরে সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গী হন।

বিভিন্ন সময়ে আফসার দেশে-বিদেশে নানান অনুষ্ঠানে যোগদানের নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের খুলনার ফুলতলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়িতে ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হন। সেইসঙ্গে রাজশাহীতে সভায় অংশগ্রহণ করেন। একই যাত্রায় ঢাকায় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতা-র সঙ্গী হন। এর বেশ কয়েক বছর পর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে আবার রাজশাহীতে আন্তর্জাতিক স্তরে জীবনানন্দ উৎসবে সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ পান।

মুখচোরা স্বভাবের হলেও আফসার আমেদ জীবনের নানান সন্ধিক্ষণে যোগদান করেছেন বা বক্তা হয়েছেন বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে বা আলোচনাচক্রে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুবাদ সাহিত্য বিষয়ক জাতীয় আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উজ্জীবনী পাঠমালায় বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ পান। যে বিপন্ন নারীদের দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিবৃত্তে আফসারের লেখনী ক্ষত-বিক্ষত, সমাজে তাদের অবস্থানকে তুলে ধরার ডাক পান দিল্লির গোলটেবিল বৈঠকে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাইম মিনিস্টার হাইলেভেল কমিটির আমন্ত্রণে সাচ্চার মহাশয়ের সভাপতিত্বে দিল্লিতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলিম নারীদের অবস্থান বিষয়ে দু-দিনের বৈঠকে আফসার অংশগ্রহণ করেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে কুলটি কলেজে ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ, লখনৌ-এ বেঙ্গল ক্লাবের আয়োজিত আলোচনাচক্রে যোগদান, সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক ওই বছরই পৃথক সময়ে আয়োজিত জীবনানন্দ এবং জসীমউদ্দিন বিষয়ক দুইটি জাতীয় আলোচনাচক্রে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

আফসারের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখব লেখালেখির পাশাপাশি সাংসারিক দায়দায়িত্বও সমানতালে পালন করেছেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনে নতুন এক মানুষের আগমন ঘটে। তিনি নাসিমা খাতুন। হাওড়ার সাঁকরাইলের রঘুদেববাটী অঞ্চলের আজাদ আলি সর্দার ও নূর কেশম বেগমের কন্যা। নাসিমার সঙ্গে ৮ মার্চ ১৯৯১ সালে আফসার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী পেয়েছিলেন আফসার আমেদ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পাশে ছিলেন। অসুস্থ লেখকের চলার পথে নানা ওঠাপড়ার সঙ্গী হয়েছিলেন। তাদের ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ বিবাহের দুই বছর পর ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল পুত্র শতাব্দ আমেদের জন্ম হয়। কন্যা কুসুম হিয়ার জন্ম এর দুইবছর পর ১২ মে ১৯৯৫ সাল। স্ত্রী–পুত্র–কন্যা এবং বাবা–মাকে নিয়েই ছিল তাঁর সাংসারিক পরিমণ্ডল। তিনি কড়িয়া গ্রামের পাট চুকিয়ে বাগনান স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি করেন ও ২০০৪ সাল থেকে সেখানে বাস করতে থাকেন। তাঁর এই বাড়িতেই ২০১২ সালের ১২ মে পিতা খলিলুর রহমান মারা যান। সুখ–দুঃখ, আনন্দ–যন্ত্রণা এমনভাবে মিলেমিশে থেকেছে তাঁর জীবনের আনাচে–কানাচে।

মানুষ হিসাবে আফসার আমেদ কতটা সুন্দর মনের অধিকারী ছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ধরা পড়ে। তিনি পথশিশুদের জন্য বেশ কয়েক বছর কাজ করেন। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রান্তিক জনকল্যাণ সমিতি এনজিও-তে পথশিশুদের কাজে লিপ্ত ছিলেন। সামান্য টাকা মাইনে দিলেও জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে ফুটপাথবাসী শিশুদের সাক্ষর করে তুলতে উৎসাহী হয়েছিলেন। এর পূর্বে তিনি ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০

খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সায়েন্সে অধ্যাপক অশোক সেনের প্রকল্পে সহকারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে অনিয়মিত কর্মী হিসাবে কাজ করে যান। তবে ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর মতো সারাজীবনব্যাপী আর্থিক দুশ্চিন্তা তাঁর পিছু ছাড়েনি। তাই, এন. জি. ও থেকে পাওয়া সামান্য টাকাও গ্রাসাচ্ছাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। তবে, সুন্দর মনটিও যে ফুটে থাকতে চায়, তাই পথশিশু ছাড়াও খোলা আকাশের নীচে থাকা ফুটপাথের মেয়েদের নিয়ে, এমনকি কলকাতার মুটে মজুরদের নিয়েও কাজ করেছেন। এ সমস্ত অভিজ্ঞতাকে লেখার মাধ্যমে পরিস্ফুট করার অভীপ্সা তিনি কখনো-কখনো প্রকাশ করেছেন। তবে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা পূরণ হল কই? পাঠকের চাহিদা কিছুটা অপূর্ণই থেকে গেল বটে !

২০০২ খ্রিস্টাব্দে আফসার আমেদ এক বিরল সৌভাগ্যের মুখোমুখি হন। বিখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন। আলোচ্য উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটির নতুন নামকরণ হয় 'আমার ভুবন'। এর দশ বছর পর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে আফসারের অপর একটি উপন্যাস 'হত্যার প্রমোদ জানি' অবলম্বনে 'রাত কত হল' সিনেমাটি তৈরি হয়। পরিচালনা করেন সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়।

আফসার আমেদ তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ সমস্ত জীবন ধরেই নানা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছেন 'সোপান' পুরস্কার, ১৯৯৫-এ ভারত সরকারের 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সংস্কৃতি বিভাগ' থেকে ফেলোশিপ, ১৯৯৮

খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ছোটোগল্পকার 'সোমেন চন্দের' নামাঙ্কিত স্মারক পুরস্কার, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' পুরস্কার ও 'কথা' পুরস্কার, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার পান অনুবাদ সাহিত্যে, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে 'মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মারক' পুরস্কার, ২০০৭-এ 'ত্রয়ী' পুরস্কার প্রাপ্ত হন— 'লোককৃতি' পুরস্কার, 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি পুরস্কার' এবং 'নতুন গতি' পুরস্কার। ২০০৯-তে 'ইসক্রা' পুরস্কার, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্কিম' পুরস্কার, ২০১৬-তে 'মহাশ্বেতা দেবী স্মারক' পুরস্কার, ২০১৭-তে দ্বিতীয়বার 'অকাদেমি' পুরস্কারে মনোনিত হন তাঁর 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসের জন্য। এছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে নানান সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। যদিও, প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারের থেকে পাঠকদের পুরস্কারকে তিনি অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন—

> "পুরস্কার পাব বলে কখনো লিখিনি। অনেক প্রতিষ্ঠান আমাকে পুরস্কার দিয়েছে, আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। আমার পুরস্কার পাঠকরা দিয়ে থাকেন। আমাকে পড়ার ভিতর দিয়ে যখন তাঁরা আমাকে পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানান, তখন আমি সত্যকারের পুরস্কৃত হই। তাঁদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া যে সত্য তা যে বানানো নয়, এটা আমি ধরতে পারি। আমার লেখার একটা বিশেষ পাঠকগোষ্ঠী আছেন। আমার লেখা পড়ার জন্য তাঁদের কাছে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।"[২৪]

এমন একজন লেখা প্রেমিক সাহিত্যিক যে পাঠকের হৃদয় নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করবেন তা বলাইবাহুল্য। এ বিষয়ে তিনি নিজেও নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন।

সাহিত্যের সক্রিয় কর্মী হলেও হরেক রকম ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন সাহিত্যিক আফসার আমেদ; তার মধ্যে একটি সিরোসিস অফ লিভার। তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত হাজারো কারণের মধ্যে এটিকেও উল্লেখ করা হয়েছে। যে রোগ বে-লাগাম মদ্যপানজনিত কারণেও হতে পারে। তবে লেখক-বন্ধু অনিশ্চয় চক্রবর্তী এ আশঙ্কা সত্য নয় বলেই জানিয়েছেন—

> "বে-লাগাম মদ্যপানের মতো আর্থিক সামর্থ্য কোনোকালেই আফসারের ছিল না। বন্ধুরা খাওয়ালে তবেই খেত এবং সে পরিমাণও নিতান্ত সামান্য। আমি নিজে আফসারের সঙ্গে রঙিন পানীয়ের আসরে বহুবার থেকেছি। সামান্য খেয়েই ওকে নিজের অনুভবের গহনে ডুবে যেতে দেখেছি।"[২৫]

উদ্ধৃত কথাগুলির সত্যতা চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারেও স্বীকৃত। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, রঙিন পানীয়ে আশক্তি ছাড়া অন্য কারণেও মানুষ সিরোসিস অফ লিভার নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, রোগের উৎস সংক্রান্ত অনুসন্ধান এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, তখন সে আলোচনা সাহিত্যচর্চা না হয়ে বইবে অন্য খাত দিয়ে। বলাইবাহুল্য, আর ফিরে পাওয়া যাবে না সাহিত্যিক আফসার আমেদকে— যিনি ৪ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মুষলধারার বৃষ্টিভেজা অপরাহ্নের মধ্যেই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছেন।

আফসার আমেদ যে কত বড়ো মাপের একজন শিল্পী ছিলেন তা তাঁর বন্ধু মাবুদ আলীর কথায় অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

"আফসার বরাবরই অন্তর্মুখী স্বভাবের। ভাবে বেশি, কথা বলে কম। প্রচার বিমুখ এই একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক শুধু নিজের কলমকেই আমৃত্যু বিশ্বাস করে। ভালো লিখলে সময় ঠিক মনে রাখবে, নইলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে— একথা আফসার মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। অনেকবার কথা প্রসঙ্গে একথা তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে।"[২৬]

আফসার আমেদ প্রচারবিমুখ লেখক ছিলেন। স্রষ্টার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে আরও অনেকেই তাঁর স্বভাবের অন্তর্মুখীনতা সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে এমদাদুল হক নূরের স্মৃতিচারণা অবশ্যই স্মরণীয়—

"বহুবার রবীন্দ্রসদনে ফাঁকা মাঠের অনুষ্ঠানে আমরা দু-জন অনুষ্ঠান শুনেছি। চেনামুখের ভিড় বাড়লেই তিনি বলেন— চলুন এখান থেকে পালাই। সবসময় নির্লিপ্ত থাকতে ভালোবাসতেন, তাঁর প্রতিভা বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু তাঁর লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায় কি অসম্ভব প্রতিভাবান তিনি।"[২৭]

অনিশ্চয় চক্রবর্তী বন্ধু আফসারের সন্তানতুল্য পাণ্ডুলিপি প্রীতির কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। যেখানে অন্য এক আফসারকে আমরা খুঁজে পাই—

"রাত জেগে আফসার লিখত ওর ওই অনবদ্য, অতুলন, সংবেদনশীল ও ছন্দময় গদ্য। এক দেড় পাতা লেখা হলেই ঘুম থেকে ডেকে তুলত

আমাকে। পড়তে বলত লেখার ওই অংশটুকু। জানতে চাইত লেখাটির চলন সম্পর্কে। আধচেতনে সেই লেখার চলন সম্পর্কে আমার মন্তব্যে আফসার কী যে আস্থা রাখত, তা ভেবে আমি আজও অবাক হয়ে যাই। নিজের পাণ্ডুলিপির প্রতি ওই শ্রদ্ধা, ওই মমত্ব, ওই যত্ন, যেন নিজের সন্তান, আমি আর কারও মধ্যে দেখিনি।"[২৮]

সহকর্মীদের দৃষ্টিতে আফসার কর্মশীল অহংকারহীন এক মানুষ। সহকর্মী পথিকের কলমে সেকথা স্পষ্ট ধরা পড়েছে—

"১৯৯৮ সালের কোনো একটা দিন। আমাদের সেই সময়ের প্রশাসন আধিকারিক চারতলার যে ঘরে বসতাম সেখানে এসে একদিন বললেন আমাদের সঙ্গে নতুন একজন কাজে যোগ দিচ্ছেন। নাম আফসার আমেদ। শুনে ভালো লাগল, যে মানুষটাকে গল্প পড়ে চিনেছি—... সেই সাহিত্যিক মানুষটি আমাদের সহকর্মী হবেন !.. উত্তেজনা চেপে রাখতে পারিনি। আলাপ হল এক বিনয়ী নিরহংকার সাহিত্যিকের সঙ্গে, যা বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। দেখতাম, একমনে টেবিলে মাথা গুঁজে কাজ করে চলেছেন আপনি। প্রুফে বা বানান নিয়ে কোনো সংশয় তৈরি হলেই নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করছেন সংকোচ সরিয়ে রেখে। বলছেন আকাদেমির বানানবিধি রপ্ত হতে কিছুটা সময় লাগবে। কাজের

প্রয়োজনে কখনো যাচ্ছেন ছাপাখানায় কখনো কম্পোজিটরের কাছে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা একাগ্রতার কোনো অভাব নেই।"[২৯]

সমমনস্ক কথা উঠে এসেছে এমদাদুল হক নূরের লেখনীতে—

"... মানুষটির সারা শরীর জুড়ে বিনয় ঝরে পড়ছে। সামান্যমাত্র অহংকার নেই তাঁর আচরণে, কথাবার্তায়-ব্যবহারে। গত বিশ বছর জুড়ে তাঁকে দেখছি একইরকম।"[৩০]

আফসার যে কতটা ঠাণ্ডা মাথার মানুষ তাও বোঝা যায় সহকর্মী পথিকের চিঠিতে—

"আপনাকে দেখে শিখেছি একজন মানুষ কীভাবে মানসিক যন্ত্রণা অর্থনৈতিক সংকট চেপে রেখে হাসিমুখে স্বাভাবিক থাকতে পারে।"[৩১]

সবশেষে প্রকাশক (দে'জ পাবলিশিং) সুধাংশুশেখর দে-র কথা বলব। যিনি তাঁকে ভালো মানুষ হিসাবে উপলব্ধি করেছেন—

"বাংলা ভাষার একটি শব্দবন্ধ বহুল ব্যবহৃত হয়। সেটি হল 'মাটির মানুষ'। এই শব্দবন্ধটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম, নিরীহ, ভালো মানুষ, নির্বিরোধী মানুষ এবং দ্বিতীয়, আক্ষরিক অর্থ যদি ধরা যায়, মাটির কাছাকাছির মানুষ। মাটি-সম্পৃক্ত মানুষ। এই শব্দগুচ্ছের দুই অর্থই আমার দেখা একজন মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি আফসার আমেদ।"[৩২]

লেখক আফসার আমেদ যে একজন প্রকৃত ভালো মানুষ ছিলেন তা তার পরিচিতজনদের কথন ভঙ্গিমায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সেই সমস্ত বক্তব্যের পথরেখা অনুসরণ করে সাহিত্যিকের জীবন কাহিনি পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

তথ্যসূত্র :

১ । আফসার আমেদ, "এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা" ('বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপকের প্রতিভাষণ), 'গাধা', সম্পাঃ মলয় সরকার, হাওড়া, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ২৩৭

২ । জীবনপঞ্জি, 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

৩ । আফসার আমেদ, "এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা" ('বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপকের প্রতিভাষণ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪

৪ । মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮

৫ । রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ্‌, 'প্রবাদমালা' (১ম খণ্ড), ২য় মুদ্রণ, নবপত্র প্রকাশন, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ৮২

৬ । সুশীল কুমার দে, 'বাংলা প্রবাদ', পরিবর্ধিত ৩য় সং, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, বইমেলা ১৩৯২, পৃ. ১৮৫

৭ । মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

৮ । অনিশ্চয় চক্রবর্তী, "লেখক, মানুষ আফসার", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

৯ । মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', পূর্বোক্ত পৃ. ২৪০

১০ । আফসার আমেদ, "লিখতে হয়, লিখে যেতেই হয়", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

১১ । মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১২। তদেব, পৃ. ২৪০

১৩। তদেব

১৪। অমলেন্দু চক্রবর্তী, "প্রথম দেখা", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

১৫। মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০

১৬। তদেব, পৃ. ২৪১

১৭। তদেব, পৃ. ২৪০—২৪১

১৮। আফসার আমেদ, "নিয়েছি অনেক, দিতে পারিনি কিছুই", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

১৯। তদেব

২০। তদেব

২১। মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১

২২। তদেব

২৩। আফসার আমেদ, "নিয়েছি অনেক, দিতে পারিনি কিছুই", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

২৪। মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০—২৪২

২৫। অনিশ্চয় চক্রবর্তী, "বন্ধু, লেখক আফসার আমেদ : এক অনম্র শ্রদ্ধা", 'সৃষ্টির একুশ শতক', সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৭

২৬। মাবুদ আলী, "ভাবতে ভালো লাগে, আফসার আমার বন্ধু", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

২৭। এমদাদুল হক নূর, "প্রাণের মানুষ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

২৮। অনিশ্চয় চক্রবর্তী, "লেখক, মানুষ আফসার", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

২৯। পথিক, "সহকর্মীকে খোলা চিঠি", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

৩০। এমদাদুল হক নূর, "প্রাণের মানুষ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

৩১। পথিক, "সহকর্মীকে খোলা চিঠি", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

৩২। সুধাংশুশেখর দে, "মাটির মানুষ আফসার আমেদ", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪